প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রথমেই অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

১ আগস্ট ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১ আগস্ট ২০১৯ ০০:১৫

আমাদের দেশে যারা শিক্ষা নিয়ে ভাবেন তারা স্বীকার করেন, আমাদের শিক্ষার বিস্তার বেড়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান সে অনুপাতে বাড়ছে না। মানের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ঘাটতি রয়েছে। শুধু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষাব্যবস্থার সব স্তরেই। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহরে অবস্থিত সেগুলো নিয়ে অনেক বেশি কথাবার্তা হয়। কিন্তু মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে তেমন কথাবার্তা হয় না।

যারা শিক্ষা বিশেষজ্ঞ তারা বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলনই তাদের চিন্তাভাবনায় প্রাধান্য পায়। কিন্তু আমার মনে হয়, মানের ঘাটতিটা শুরু হয় মৌলিক পর্যায় থেকেইÑ প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই একটি গাছের শিকড় যদি মজবুত না হয় তা হলে সে গাছ শক্তিশালী হতে পারে না। সেজন্য আমাদের নজর দিতে হবে মৌলিক পর্যায়ে। শিক্ষার মৌলিক পর্যায়ের পর দুটি স্তর আছেÑ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক।

আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ বলা আছে, প্রাথমিক পর্যায় হবে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। প্রথম শ্রেণির আগেও শিক্ষার্থীরা দু-এক বছর প্রস্তুতিমূলকভাবে বিদ্যালয়ে কাটাতে পারে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝখানে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেটা স্তিমিত হয়ে গেছে আর সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ শিক্ষানীতির এই একটা অংশ বাস্তবায়িত হয়নি।

শিক্ষানীতিতে নেই পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার বিষয়টি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণিতে শুধু যে সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে তা নয়, এগুলোকে খুব মূল্যবান বলে ধরা হচ্ছে। এসব পরীক্ষার ফলে অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। প্রথমত, এই পরীক্ষা শিক্ষাকে মুখস্থনির্ভর, কোচিং বাণিজ্যকেন্দ্রিক করে তুলছে। গ্রাম পর্যন্ত এখন কোচিং বাণিজ্য সম্প্রসারিত। কোচিং হয়তো একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় পাস করায়, কিন্তু তার মেধার বিকাশ ঘটায় না। যখন শিক্ষা মুখস্থনির্ভর হয় (ইংরেজিতে একে বলে ৎড়ঃব ষবধৎহরহম) তাতে মেধার ঘাটতি বড় হয়ে দেখা দেয়। পৃথিবীব্যাপী শিক্ষাচিন্তাবিদরা বলেন, মুখস্থবিদ্যা পরিপূর্ণ শিক্ষার বড় শত্রু তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুখস্থ করা প্রয়োজনÑ যেমন, আমরা ছোটবেলায় নামতা শিখেছি। সেগুলো এখনো মনে আছে। কিন্তু যেখানে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা বা নিজের মতো করে একটি বিষয় অনুধাবন করা প্রয়োজন, সেখানে মুখস্থ পাঠ কাজে লাগবে না, এটি শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আমার কিছু প্রস্তাবনা আছে। প্রথমত, এই শিক্ষা নিয়ে আমাদের একটি সামূহিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। প্রাথমিক নিয়ে কৌশলপত্র তৈরি করে একটা নীতির আলোকে এই শিক্ষাকে আমরা পাঁচ বছর, দশ বছর, বিশ বছরে কোথায় নিয়ে যেতে চাই তার সুস্পষ্ট রূপরেখা, দর্শন ও নির্দেশনা সেখানে থাকবে। এর সঙ্গে সমন্বয় করে মাধ্যমিকের একটা রূপরেখা তৈরি করতে হবে। যেহেতু প্রাথমিক গিয়ে পড়ে মাধ্যমিকে, মাধ্যমিক গিয়ে পড়ে উচ্চ মাধ্যমিকে। আমার আরও একটি প্রস্তাব : মাধ্যমিককে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হোক। ক্যাডেট কলেজগুলোসহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে তা করেছে। কলেজটা একটা স্বতন্ত্র এবং আলাদা অস্তিত্ব হিসেবে টিকে থাকার কারণ নেই। মাধ্যমিক পর্যায় দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত করা হলে একটা সমন্বিত কার্যক্রম হাতে নেওয়া যায়, শিক্ষার মান তাতে বাড়বে। পশ্চিমের অনেক দেশে, উত্তর আমেরিকাতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত হাইস্কুল। তার পর বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বাদশ শ্রেণি পাস করে কেউ চাকরি করতে চাইলে করতে পারে, কারণ মোটামুটি একটা যোগ্যতা তাদের হয়ে যায়।

advertisement

কৌশল পত্রগুলোয় শিক্ষার যাবতীয় উপাদান সন্নিবেশিত হবে। অর্থাৎ আমাদের পাঠ্যক্রম কী হবে, শিক্ষক কিসের ভিত্তিতে নিয়োগ দেব, শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে চলবে, পাঠদান কেমন হবে, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কীভাবে চলবেÑ এসব বিষয়ে দিকনির্দেশনা সেগুলোতে থাকবে। সবচেয়ে বড় কাজ হবে শিক্ষার মানোন্নয়ন।

পাশাপাশি শিক্ষকদের জন্য আলাদা একটা বেতন কাঠামো তৈরি করা উচিত। এই প্রস্তাবে প্রশাসন অখুশি হতে পারে, সরকার বাহানা তুলবে টাকা নেই। কিন্তু আমি মনে করি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়াতে হবে, তা না হলে ভালো শিক্ষক পাওয়া যাবে না, আর ভালো শিক্ষক না থাকলে শিক্ষার মান কোনোদিনই বাড়বে না। শিক্ষার্থী তৈরি করতে পারব না। অল্প বেতন বলে মেধাবীরা এই পেশায় আসতে চায় না।

কৌশলপত্রগুলো শিক্ষানীতির আলোকেই তৈরি হবে। এগুলোতে অনেক মৌলিক বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। যেমনÑ শ্রেণিঘণ্টা, দুপুরের খাবার, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, খেলার মাঠ, সুন্দর ও ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ। এগুলো হলো শিক্ষার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। সরকারকে অর্থের জোগান দিতেই হবে। কারণ এই কৌশলপত্র সরকার প্রণয়ন করবে এবং এর মালিকানা গ্রহণ করবে। পাঁচ বছর পর পর সরকার আসে-যায়, যে সরকার আসুক তার বাধ্যবাধকতা থাকবে এই কৌশলপত্রগুলো বাস্তবায়ন করা। এসব প্রণয়ন করবেন শিক্ষাবিদরা বিদেশি বিশেষজ্ঞদের, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশের যেখানে শিক্ষার মান উন্নত, পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। যারা এই বিষয় নিয়ে নিরন্তর ভাবনা-চিন্তা করছেন কিন্তু আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছেন এবং যারা স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গেও পরামর্শ করতে হবে। এগুলো করতে এক বছরের বেশি সময় লাগার কথা নয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা হলোÑ সব ধরনের শিক্ষাকে কোচিং বাণিজ্য ধারা থেকে বের করে এনে প্রকৃত সৃজনশীল ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। বর্তমানে সৃজনশীল ধারার নামে যা হচ্ছে, তা মোটেও সৃজনশীল নয়। সৃজনশীল শিক্ষায় বুদ্ধি, কল্পনা ও উদ্ভাবনী চিন্তার সমন্বয় ঘটে। শিক্ষায় বিজ্ঞান, মানবিক ও অন্যান্য বিষয়ের সম্মিলন ঘটবে। যাকে লিবারেল আর্টস এডুকেশন বলে, তা হওয়া উচিত আমাদের শিক্ষার রূপ।

শিক্ষার পাশাপাশি মানসিক ও দৈহিক বিকাশের প্রয়োজন আছে। সেজন্য স্কুলে বেশ কিছু ক্লাব থাকবে, আমাদের আশপাশের অনেক দেশে ক্লাবের ব্যবস্থা আছে। স্কুলে নয় মাস পড়ালেখার পেছনে ব্যয় করুক শিক্ষার্থীরা, আর বাকি তিন মাস ব্যয় করুক সৃজনশীলতার চর্চায়। প্রকৃতি ক্লাবের সদস্যরা বেরিয়ে পড়বে প্রকৃতি দর্শনে। বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা বিজ্ঞানচর্চা করবে। এর পাশাপাশি খেলাধুলা, আবৃত্তি ও অভিনয় করবে। পাঠ্যবইয়ের বাইরের বই পড়বে। একজন শিক্ষার্থী একাধিক ক্লাবের সদস্য হবে। প্রত্যেক ক্লাবের সদস্যরা তাদের কর্মকা- ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখবে, বলবে, প্রদর্শনী করবে, সেগুলো হবে তার বার্ষিক মূল্যায়নের অংশ। ৬০-৬২ হাজার প্রাথমিক (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) বিদ্যালয়কে যদি সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে তৈরি করতে পারি তা হলে এক প্রজন্মে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব ঘটাতে পারব। বিদ্যালয়গুলোতে শৃঙ্খলা শেখানো হবে, সংস্কৃতিসেবী খেলোয়াড়, বিজ্ঞানী এদের নিয়মিত আমন্ত্রণ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সময় কাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবেশ তৈরি করতে পারলে শিক্ষার্থীদের মনের জানালাগুলো খুলে যাবে। ফলে মাদকের চিন্তা দূর হয়ে যাবে। খেলাধুলায় গতিশীলতা আসবে। শারীরিকভাবে তারা ভালো থাকবে, তাদের মানসিকতার উন্নতি হবেÑ এসবই হলো সৃজনশীলচর্চার ভিত্তি।

সেজন্য আবার বলছি, সরকারকে এখানে কার্পণ্য দেখালে চলবে না। মনে রাখতে হবে শিক্ষা হলো জাতির শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। পদ্মা সেতুর জীবনকাল একশ বছর, রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের আরও অনেক কম, অথচ শিক্ষায় কয়েক লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ হলে ত্রিশ বছরে তা এক হাজার গুণ সমাজকে ফিরিয়ে দেবে।

আমার তৃতীয় প্রস্তাব হলো- মুখস্থনির্ভর ও কোচিং-টিউশন বাণিজ্য যাতে চিরতরে বন্ধ হয়ে সে চেষ্টা করতে হবে। কিছু কিছু কোচিং বাণিজ্য থাকবে, যেটা বিদেশেও আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এসব সমান্তরাল শিক্ষা পদ্ধতি হতে পারে না। এখন অনেকে স্কুলে না গিয়ে কোচিংয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়েও এই চর্চা চলে আসছে। কোচিং বাণিজ্য থেকে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা আয় হয়। সবচেয়ে লোভনীয় বাণিজ্যের একটি হলো কোচিং বাণিজ্য।

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এই বাণিজ্যের কুশীলবদের কারণে চালু হয়েছে। এসব পরীক্ষার ভারে শিক্ষার্থীরা ক্লান্ত।

পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আমার একটি প্রস্তাবনা আছে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষা তুলে দিয়ে শ্রেণিভিত্তিক মূল্যায়নকে গুরুত্ব দিতে হবে। বার্ষিক যে পরীক্ষা হবে সেটাতে ৪০-৫০ নম্বর থাকবে। বাকি ৫০-৬০ নম্বর হবে শ্রেণিভিত্তিক পরীক্ষা, যাতে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রকৃত সৃজনশীলতা প্রধান হবে।

ওই যে ক্লাবগুলোর কথা বললাম। ক্লাবে যে বই পড়েছে আর যা যা কাজ করেছে, তার ওপরও একটা পরীক্ষা থাকবে, তবে ঘটা করে নয়। পরীক্ষাটা এমনভাবে হবে যেন শিক্ষার্থী চিন্তাভাবনা করে, নিজের মেধাকে জাগিয়ে তাতে অংশ নিতে পারে। (চলবে)

য় সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক